দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 18 APR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

144

গণতন্ত্রের জন্য চাই সর্বজনীন শিক্ষা

আবদুল্লাহ আল-মুতী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা দেশের সমগ্র জনগণের বিকাশকে আমাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলাম। আর এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়েছিল। সে জন্যই স্বাধীনতা লাভের পর পরই দেশের নতুন সরকার ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন যে সব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে সব মানুষের শিক্ষার কথা বেশ জোর পেয়েছিল। সম্প্রতি যে সরকারি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতেও সর্বজনীন শিক্ষাকে অতি দ্রুত সাফল্যমন্ডিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে শুধু নীতিতে কথাটা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে কাজে পরিণত করাটাই জরুরি।

... মানুষের সভ্যতার ক্রম- ... দিয়ে কতকগুলো ধারণা অনেকটা ...ৃত নীতির মর্যাদা পেয়েছে; তার মধ্যে পড়ে ...ণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ...মানাধিকার, সবার জন্য রুটি রুজি শিক্ষা স্বাস্থ্য ...থা-গোঁজার ঠাঁইয়ের অধিকার-এমনি সব ...রণাগুলো। গণতন্ত্র বলতেই বোঝায় সাধারণ খেটে ...ওয়া মানুষদের অধিকারের স্বীকৃতি; আর তার ... সব মানুষের শিক্ষার প্রশ্নটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ...ে।

...ত্র কয়েকশ' বছর আগেও এসব ধারণা ...কের মতো এভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তার ... তখন অবস্থা আজকের থেকে অনেকটা ভিন্ন ...ম ছিল। তখন ধরে নেয়া হতো সমাজের সব ...মতার অধিকারী হলো রাজা, জমিদার আর পুরোহিত- মোল্লা শ্রেণী; তারা ঐশী বিধানের বলে ...দের সে অধিকার পেয়েছে। দেশের সাধারণ প্রজাদের কাজ হলো কেবল হুকুম তামিল করা, খেটে যাওয়া আর ফসল ফলানো। সব ধরনের শিক্ষা আর জ্ঞান থেকে যে শক্তি লাভ করা যায় তারও অধিকার ছিল কেবল অভিজাত সমাজের লোকদের। ...পনের শতকে ছাপাখানার উদ্ভব ঘটার ফলে বইপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার বেশ সহজ হয়ে গেল; কিন্তু তার পরও বহু যুগ ধরে সে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারত কেবল সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা। ধরেই নেয়া হতো যে, চাষাভুষোদের জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার অধিকার দেয়া যায় না; কি জানি তাতে যদি তাদের চোখ ফুটে গিয়ে মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে! চাষাভুষোদের যদি বা কিছু পড়বার সুযোগ দেয়া হতো তাও খুব সাবধানে ভালমতো যাচাই করে।

যুগ যুগের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ যে গণতন্ত্রের অধিকার লাভ করেছে তাতে এ অবস্থা অনেকটা বদলে গিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে আজ গণতন্ত্রের জয় জয়কার। রাজ-রাজড়াদের সনাতন আধিপত্যের অবসান ঘটেছে; যেসব দেশে রাজতন্ত্র এখনও টিকে আছে সেখানেও তার প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ অবস্থা। তবু গণতন্ত্রের বিকাশ বা সামাজিক পরিবর্তন সব দেশে সমান তালে ঘটেনি। জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কথা বলছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, তেমনি সারা পৃথিবীতে সব মানুষের শিক্ষার অধিকার, পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার নিয়েও হয়ে উঠছে উচ্চকণ্ঠ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯১ শুরু হয়েছে এই মূলনীতির ঘোষণা দিয়ে; নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে মানুষকে রাখতে হবে সব উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে; মানুষকে ঘিরে বুনতে হবে সব উন্নয়ন, উন্নয়নকে ঘিরে মানুষ নয়।" আর এই মূলনীতির স্বীকৃতি থেকেই সারা পৃথিবীতে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আজ যেমন আলোড়ন চলছে ইতিহাসে এর আগে ... কখনো এমন হয়নি। আজ এটা ক্রমেই স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, সমাজকে গড়তে হলে আগে সে সমাজের মানুষকে গড়বার আয়োজন চাই।

মানুষের সবরকম প্রতিভা আর ক্ষমার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আজ আর কোন বিতর্ক নেই। আর তাই সব মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অধিকারও আজ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ শতক জুড়ে অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রবার্ট সলো, আর্থার শুলজ্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটে তা শুধু ব্যক্তি মানুষের বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর একারণেই জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯০ সালে বিশ্বসম্মেলন ডেকে তাতে ২০০০ সালের মধ্যে দুনিয়ার সব মানুষের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করার ডাক দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের ডাকে এই উদ্যোগে শরিক হয়েছে

বাংলাদেশের মতো দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলোও। প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে বেশ বিস্তৃত একটা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল অতি সাদাসিধে ধরনের। একজন গুরু বা ওস্তাদের কাছে গুটিকয়েক শিষ্য বা সাগরেদ লেখাপড়া করত। প্রথম প্রথম লেখাপড়া ছিল প্রধানত মুখে মুখে শেখা; তারপর এলো তালপাতায় বা তুলট কাগজে হাতে লেখা পুঁথি। আর শেখা মানে হলো প্রধানত মুখস্থ করা; কখনো তার সঙ্গে শিখতে হতো 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এমনি ধারার তর্কের কূটজাল। কী ইউরোপে কী এই উপমহাদেশে বিদ্যাচর্চা বলতে বোঝাত প্রধানত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা।

শিক্ষার আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল তা প্রধানত সমাজের উঁচুতলার মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কোন কোন ধর্মমতে এই সীমাবদ্ধতার গন্ডি ছিল বেশ কঠোর; যেমন প্রাচীন আর্য সমাজে। আবার কোথাও সেটা ছিল অনেকটা শিথিল; যেমন বৌদ্ধ ধর্মে বা ইসলাম ধর্মে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ইংরেজরা এদেশে এলো তখন তারাও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে প্রধানত এদেশের অভিজাত সমাজের লোকদেরকে। অবশ্য আজ গণতন্ত্রের ধারণা প্রসার লাভ করায় এ অবস্থা অনেকটা বদলে গিয়েছে; জ্ঞানচর্চার উপর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের সমানাধিকার আজ পৃথিবীর সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী জগতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে মার্কিন শিক্ষাবিদ জন ডিউই-র (১৮৫৯-১৯৫২) ভাবধারা। ডিউই বললেন, শিক্ষা শুধু আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নয়, বর্তমান জীবন যাপনের কলাও তার আওতাভুক্ত। কাজেই প্রতিটি বর্তমান অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলা, সেসব অভিজ্ঞতা থেকে তাৎপর্য আহরণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্য অর্জন সমাজকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, কেননা ব্যক্তি মানুষকে নিয়েই সমাজ আর ব্যক্তির সকল অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল সমাজ ও পরিবেশের উপরে। কাজেই জীবনের সঙ্গে, সমাজের ও পরিবেশের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই তা অর্থহীন। শুধু জ্ঞান আর কলাকৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা নয়; জীবন, পরিবেশ ও সমাজের প্রয়োজনে তাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই জীবন, সমাজ আর পরিবেশ বদলে যায় দেশে দেশে, একটি দেশের মধ্যেও বদলে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আজ যে আমরা বিশ শতক পেরিয়ে আরেক নতুন শতকে প্রবেশ করতে চলেছি তার জন্যও শিক্ষার বিশেষ ধরনের চাহিদার কথা আমাদের সবাইকে নতুন করে বিবেচনা করতে হচ্ছে।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক নব্বইয়ের দশকের শুরুতে (১৯৯৩) বিশিষ্ট ফরাসী বুদ্ধিজীবী জাক দেলর (Jaques Delors)-কে সভাপতি করে 'একুশ শতকের শিক্ষার জন্য' একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন সম্প্রতি মহাপরিচালকের কাছে তাদের রিপোর্ট দাখিল করেছেন। "শেখা : ভেতরের যে সম্পদ" নামে প্রকাশিত এই রিপোর্টে যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার চারটি মূল স্তম্ভ নির্দেশ করা হয়েছে : জানতে শেখা, করতে শেখা, বাঁচতে শেখা আর মিলেমিশে বাস করতে শেখা। এই চারটি ভিতের উপর প্রতিটি মানুষকে সারাজীবন ধরে শিখে যেতে হবে; শেখার ব্যাপারে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একটা ভূমিকা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আসল শেখাটা ঘটবে শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টায়। আর সে শেখা যে শুধু তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান আর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে তা নয়, সৃষ্টি করবে তার বিশ্লেষণক্ষমতা আর কাজ করবার ক্ষমতাও। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা দেশের সমগ্র জনগণের বিকাশকে আমাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলাম। আর এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়েছিল। সে জন্যই স্বাধীনতা লাভের পর পরই দেশের নতুন সরকার ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন যে সব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে সব মানুষের শিক্ষার কথা বেশ জোর পেয়েছিল। সম্প্রতি যে সরকারি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতেও সর্বজনীন শিক্ষাকে অতি দ্রুত সাফল্যমন্ডিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে শুধু নীতিতে কথাটা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে কাজে পরিণত করাটাই জরুরি।

গত কয়েক দশকে নানা দেশে অর্থনীতিবিদদের নানা গবেষণার ফলে এ সত্য আজ সকল মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সেরা উপায় হলো দেশের জনশক্তিকে আজ ও আগামী দিনের সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করা। আমাদের যে শক্তি আছে তারই চরম বিকাশ হবে, আমরা যা হতে পারি তা সম্পূর্ণভাবে হবো-তাই হবার কথা শিক্ষার ফল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, দাসত্ব থেকে মুক্তির লক্ষ্য আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সবার সামনে নিয়ে আসতে হবে। আর তা যখন ঘটবে তখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকারভাবে এদেশে গণতন্ত্রকে স্থায়ী আসন দেবার একটি প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠবে।